بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ মে, ২০২২ মোতাবেক ১৩ হিজরত, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে যেসব নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে যেসব অভিযান সংঘটিত হয়েছে তার আলোচনা চলছিল। এ প্রসঙ্গে বুতাহ্ অঞ্চল অভিমুখে মালেক বিন নুয়ায়রার দিকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর অগ্রযাত্রার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হলো, বুতাহ্ বনু আসাদ গোত্রের অঞ্চলাধীন একটি ঝরনার নাম। মালেক বিন নুয়ায়রা বনু তামীম গোত্রের একটি শাখা বনু ইয়ারবূ গোত্রের সদস্য ছিল। সে নবম হিজরী সনে স্বজাতির লোকদের সাথে মদিনায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মালেক বিন নুয়ায়রা তার জাতির সরদারদের একজন ছিল। আরবের সনামধন্য বীর এবং দক্ষ অশ্বারোহীদের মাঝে তাকে গণনা করা হতো। মহানবী (সা.) তাকে তার গোত্রের যাকাতের সম্পদ আদায় এবং তা একত্র করার দায়িত্ব অর্পণ করে যাকাতের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন এবং আরবদের মাঝে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের ঢেউ উঠে তখন মালেক বিন নুয়ায়রাও মুরতাদদের মাঝে একজন ছিল। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ যখন তার কাছে পৌঁছে তখন সে আনন্দ ও উল্লাসের আয়োজন করে। তার ঘরের নারীরা মেহেদি লাগায়, ঢাক-ঢোল বাজায় এবং খুবই আনন্দ ও প্রফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ করে। এছাড়া সে নিজ গোত্রের সেসব মুসলমানদের হত্যা করে যারা যাকাত দেয়াকে আবশ্যক জ্ঞান করার পাশাপাশি যাকাতের সম্পদ মুসলমানদের কেন্দ্র তথা মদিনায় প্রেরণেও বিশ্বাসী ছিল। অতএব, এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে বা যার বিরুদ্ধেই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সে মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেছিল, মুরতাদ হওয়া-ই তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল না। যাহোক এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, সে একদিকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং যাকাতের গচ্ছিত সম্পদ স্বজাতির লোকদের ফিরিয়ে দেয়, অপরদিকে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারী বিদ্রোহী মহিলা সাজাহ্-এর সাথে যোগ দেয় যে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করার জন্য এসেছিল। এটি দ্বিতীয় বিষয় যে, সে মদিনায় আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। তার পুরো নাম ছিল সাজাহ্ বিনতে হারেস। সাজাহ্-র পরিচয় হলো, তার নাম ছিল সাজাহ্ বিনতে হারেস। ডাকনাম ছিল উম্মে সাদের। এই মহিলা আরবের এক নারী গণক ছিল আর সেই কতিপয় নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারী ও বিদ্রোহী গোত্রপ্রধানদের একজন ছিল যারা আরবে ধর্মত্যাগের সূত্রপাতের কিছুসময় পূর্বে বা ঠিক সেসময়ই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাজাহ্ বনু তামীম গোত্রের সদস্যা ছিল এবং মায়ের দিক থেকে তার বংশধারা বনু তাগলেব গোত্রের সাথে মিলিত হয়, যাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান ছিল। সাজাহ্ নিজেও খ্রিষ্টান ছিল এবং তার খ্রিষ্টান গোত্র ও পরিবারের কল্যাণে খ্রিষ্টধর্মের একজন ভালো নারী আলেম ছিল। সে তার শিষ্যদের নিয়ে ইরাক থেকে এসেছিল এবং

মদিনায় আক্রমণের ইচ্ছা করেছিল। কতিপয় ঐতিহাসিকের ভাষ্য হলো, সাজাহ্ পারসিকদের ষড়যন্ত্রের অধীনে আরবে প্রবেশ করেছিল যেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পারস্য সাম্রাজ্যের বিলুপ্তপ্রায় ক্ষমতাকে খানিকটা ধরে রাখা যায়। যাহোক সাজাহ্ এসব বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করে। এটি পুরোপুরি স্বাভাবিক বিষয় ছিল যে, সে সর্বপ্রথম তার গোত্র বনু তামীমে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে একদল লোক এমন ছিল যারা যাকাত আদায় করতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফার আনুগত্য করতে চাইছিল, কিন্তু উক্ত গোত্রের অপর পক্ষ তাদের বিরোধিতা করছিল। তৃতীয় আরেকটি পক্ষও ছিল যারা বুঝতে পারছিল না যে, কী করবে আর কী করবে না। যাহোক, এই মতানৈক্য এতটাই চরম রূপ ধারণ করে যে, বনু তামীম গোত্র নিজেদের মাঝেই লড়াই, মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরই মাঝে এসব গোত্র সাজাহ্-র আগমনের সংবাদ পায় আর তারা এটিও জানতে পারে যে, সাজাহ্ মদিনায় পৌঁছে আবু বকর-এর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখে। এর ফলে মতবিরোধ আরও বিস্তার লাভ করে। সাজাহ্ এই উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হতে থাকে যে, সে তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অকস্মাৎ বনু তামিমে পৌঁছে যাবে এবং নিজের নবুয়্যতের ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাবে। পুরো গোত্র সম্মিলিতভাবে তার সাথে যোগ দিবে এবং উয়ায়না-র ন্যায় বনু তামীম-ও তার সম্পর্কে এটি বলা আরম্ভ করবে যে, বনু ইয়রবূ-র মহিলা নবী কুরায়েশদের নবীর চেয়ে উত্তম, কেননা মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন আর সাজাহ্ জীবিত আছে। এরপর সে বনু তামিম-কে সাথে নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হবে– এ ছিল তার পরিকল্পনা। আর আবু বকর-এর সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে জয় লাভ করে সে মদিনা দখল করে নিবে। যাহোক, সাজাহ্ এবং মালেক বিন নুয়ায়রা-র পরস্পরের সাথে যোগাযোগও হয়। সাজাহ্ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে বনু ইয়ারবূ-এর সীমান্তে পৌঁছে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করে এবং গোত্রপ্রধান মালেক বিন নুয়ায়রাকে ডেকে সন্ধি করার ও মদিনায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে নিজের সাথে যাওয়ার আহ্বান জানায়। মালেক সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সে তাকে মদিনায় আক্রমণের চিন্তা থেকে সরে আসার পরামর্শ দেয় এবং বলে, মদিনায় পৌঁছে আবু বকর-এর সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার চেয় উত্তম হবে প্রথমে নিজ গোত্রের বিরোধী শক্তিকে সমূলে উৎপাটন করা। সাজাহ্রও এই প্রস্তাব পছন্দ হয় এবং সে বলে, তোমার যা ইচ্ছা, আমি তো কেবল বনু ইয়ারবূ-এর একজন মহিলা। তুমি যা বলবে আমি তা-ই করব। সাজাহ্ মালেক ছাড়াও বনু তামীম গোত্রের অন্য সর্দারদেরও সন্ধির আহ্বান জানায়, কিন্তু ওকী ছাড়া আর কেউ সেই আহ্বানে সাড়া দেয় নি। এতে সাজাহ্, মালেক ও ওকী এবং নিজ সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে অন্যান্য সর্দারদের ওপর আক্রমণ করে বসে। তুমুল যুদ্ধ হয় যাতে উভয়পক্ষের অগণিত মানুষ মারা যায় এবং একই গোত্রের লোকেরা একে অপরকে বন্দি করে, কিন্তু কিছুকাল পরেই মালেক ও ওকী বুঝতে পারে যে, তারা সেই মহিলার কথা শুনে মহাভুল করেছে। অতঃপর তারা অন্যান্য সর্দারদের সাথে সন্ধি করে নেয় এবং একে অপরের বন্দিদের ফিরিয়ে দেয়। এভাবে তামীম গোত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই পর্যায়ে সাজাহ্ যখন দেখে যে, এখানে কার্যসিদ্ধি কঠিন হবে, অর্থাৎ সে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল তা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, তখন সে বনূ তামীম থেকে নিজের বিছানাপত্র ও তল্পিতল্পা গুটিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নিবাহ্ নামক এলাকায় পৌঁছে অওস বিন খুযায়মা-র সাথে তার মোকাবিলা হয় যাতে সাজাহ্ পরাজিত হয়। আর অওস বিন খুযায়মা তাকে এ শর্তে ফিরে যেতে দেয় যে, সে মদিনার দিকে আর পা বাড়াবে

না কল্পে দৃঢ় সংকল্প করবে। এ ঘটনার পর আরব উপদ্বীপের সেনাবাহিনীর সর্দাররা একস্থানে একত্রিত হয় এবং তারা সাজাহ্-কে বলে, এখন আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিতে চান? মালেক এবং ওকী নিজ জাতির সাথে সন্ধি করে নিয়েছে। তারা আমাদেরকে সাহায্য করতেও প্রস্তুত নয় এবং এতেও সম্মত নয় যে, আমরা তাদের এলাকা অতিক্রম করব। আর এদের সাথেও আমরা এই চুক্তি করেছি এবং মদিনায় যাওয়ার পথও আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বল, আমরা কী করব? সাজাহ্ উত্তরে বলে, মদিনা যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেলেও কোন চিন্তা নেই, তোমরা ইয়ামামা চল। ইয়ামামাবাসীরা মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। আর মুসায়লামা-র শক্তি ও সামর্থ্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তার বাহিনীর নেত্রীবৃন্দ যখন সাজাহ্-র কাছে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন সে বলে,

عليكم باليمامة، ودفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة، لا تلحقكم بعدها ملامة

অর্থাৎ, ইয়ামামা চল। কবুতরের ন্যায় ক্ষীপ্রতার সাথে তাদের ওপর আক্রমণ কর। সেখানে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে, যার পরে তোমাদের আর কখনো লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে না। এই ছন্দবদ্ধ বাক্যাবলী শোনার পর, যেগুলোকে তার সেনাদলের লোকেরা ওহী মনে করতো, অর্থাৎ সে নবী এবং এগুলো তার প্রতি ওহী হয়েছে, তাদের জন্য তার নির্দেশ পালন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অতএব তারা নির্দেশ পালন করে। সাজাহ্ যখন নিজ সেনাদলের সাথে ইয়ামামা পৌঁছে তখন মুসায়লামা বেশ চিন্তিত হয়। সে ভাবে যে, সে যদি সাজাহ্-এর সেনাদলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তার শক্তি হ্রাস পাবে (এবং) মুসলিম বাহিনী তার ওপর আক্রমণ করে বসবে, আর আশেপাশের গোত্রগুলোও তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করবে। একথা চিন্তা করে সে সাজাহ্-র সাথে আপোষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে সে তার কাছে উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করে। এরপর এই বার্তা প্রেরণ করে যে, সে নিজে তার সাথে দেখা করতে চায়। সে মুসায়লামাকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করে। মুসায়লামা বনু হানীফা-র চল্লিশ ব্যক্তির সাথে তার কাছে আসে এবং একান্তে তার সাথে আলোচনা করে, আর এই আলোচনায় মুসায়লামা কিছু ছন্দবদ্ধ বাক্যাবলী সাজাহ্-কে শোনায়, যেগুলোতে সে খুবই প্রভাবিত হয়। সাজাহ্-ও উত্তরে তদ্রুপ কতিপয় বাক্যাবলী শোনায়। সাজাহ্কে পুরোপুরি নিজ করায়ত্বে নেয়া ও সমমনা করার জন্য মুসায়লামা এই প্রস্তাব উপস্থাপন করে যে, চল আমরা উভয়ে নিজেদের নবুয়্যতকে একত্রিত করে নেই আর পরস্পরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই, অর্থাৎ বিয়ে করে নেই। সাজাহ্ এই পরামর্শ গ্রহণ করে আর মুসায়লামার সাথে তার তাঁবুতে চলে যায়। তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের পর সে নিজ সেনাদলের মাঝে ফিরে আসে এবং নিজ সঙ্গীদের কাছে উল্লেখ করে যে, সে মুসায়লামাকে সত্যের ওপর পেয়েছে, তাই তাকে বিয়ে করে নিয়েছে। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, কিছু মোহরানা নির্ধারণ করেছেন কি? সে বলে, মোহরানা তো নির্ধারণ করা হয় নি। তারা তাকে পরামর্শ দেয় যে, আপনি ফিরে যান এবং মোহরানা নির্ধারণ করে আসুন, কেননা আপনার মতো ব্যক্তিত্বের জন্য মোহরানা ছাড়া বিয়ে করা সমীচীন নয়। অতএব সে মুসায়লামার কাছে ফিরে যায় এবং তাকে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে। মুসায়লামা তার জন্য এশা ও ফজরের নামায হ্রাস করে দেয়। অর্থাৎ এশা ও ফজরের নামায কমিয়ে দেয় বা বন্ধ করে দেয়। যাহোক, মোহরানার বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, মুসায়লামা ইয়ামামা-র জমিগুলোর খাজনার অর্ধেক উপার্জন সাজাহ্কে প্রদান করবে। সাজাহ্ এই দাবি

করে যে, সে যেন আগামী বছরের অর্ধেক উপার্জন থেকে তার অংশ অগ্রিম প্রদান করে। এতে মুসায়লামা অর্ধেক বছরের উপার্জনের অংশ তাকে দিয়ে দেয়, যা নিয়ে সে জাযিরা ফিরে আসে। বাকি অর্ধেক বছরের উপার্জনের অংশ আদায়ের জন্য সে নিজের কিছু লোককে বনু হানীফাতেই রেখে আসে। সাজাহ্ পূর্বের ন্যায় বনু তাগলেব-এ অবস্থান করে। পরবর্তীতে সে তওবা করে নেয়। এ সম্পর্কে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কারো কারো মতে হযরত উমরের খিলাফতকালে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এমনকি হযরত আমীর মুআবিয়া দুর্ভিক্ষের বছর তাকে তার গোত্রের সাথে বনু তামীম-এ প্রেরণ করেন, যেখানে সে আমৃত্যু মুসলমান হিসেবে বসবাসরত ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তুলায়হা আসাদীর বিষয়টি নিষ্পত্তি শেষে মালেক বিন নুয়ায়রার মোকাবিলার জন্য যাবেন, যে বুতাহ্-তে অবস্থানরত ছিল। হযরত খালেদ যখন বুতাহ্ আসেন তখন তিনি সেখানে কাউকে-ই পান নি, যদিও তিনি দেখতে পান যে, মালেক যখন নিজের বিষয়ে শঙ্কিত হয় তখন সে নিজের সকল সঙ্গীকে তাদের সম্পত্তির দেখাশোনার জন্য প্রেরণ করে আর একত্রিত হতে নিষেধ করেছে। তার এই ধারণা হয় যে, এখন মোকাবিলা কঠিন হবে, পূর্বেই হয়ত সেই মহিলার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল, এটিও কারণ হতে পারে। যাহোক, হযরত খালেদ বিভিন্ন সেনাদল এদিক-ওদিক প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে এই নির্দেশ দেন যে, যেখানেই পৌঁছবে সেখানে প্রথমে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে। যে এর উত্তর দিবে না তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসো আর যে মোকাবিলা করবে তাকে হত্যা কোরো। সেসব দলের মাঝেই একটি দল মালেক বিন নুয়ায়রাকে, যার সাথে বনু ছালেবা বিন ইয়রবূ-এর কতিপয় লোক আসেম, ওবায়েদ, আরীন এবং জাফের ছিল, গ্রেফতার করে হযরত খালেদ-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। এই সেনাদলের লোকদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদাও ছিলেন, তার মতানৈক্য হয়। এখানে একটি বর্ণনা রয়েছে যা উরওয়া'র পিতা থেকে বর্ণিত যে, তখন যুদ্ধাভিযানের পর লোকজন এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, যখন আমরা আযান দিই, একামত বলি এবং নামায পড়ি, তখন তারাও এমনটিই করেছে; কিন্তু অন্যরা বলে যে, না, এমন কিছুই ঘটে নি। হযরত আবু কাতাদা (রা.) এই সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তারা আযান দিয়েছে, একামত বলেছে এবং নামায পড়েছে। এই পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্যের কারণে হযরত খালেদ (রা.) তাদেরকে বন্দি করেন। মালেক বিন নুয়ায়রা-র হত্যা সম্পর্কে দু'ধরনের রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মালেক বিন নুয়ায়রা-কে হত্যা করা হয়েছিল। এক বর্ণনানুযায়ী সেই রাতে এত প্রচণ্ড শীত ছিল যে, কোন কিছুই শীত নিবারনের জন্য যথেষ্ঠ ছিল না। যখন শীতের দাপট আরও বৃদ্ধি পায় তখন হযরত খালেদ (রা.) এক আহ্বানকারীকে নির্দেশ দিলে সে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে যে, 'আদফিউ' আসারাকুম' অর্থাৎ স্বীয় বন্দিদেরকে উষ্ণতা দান কর। অর্থাৎ তাদেরকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা কর। কিন্তু বনু কিনানা-র প্রবাদ অনুযায়ী, সেখানে প্রবাদ ভিন্ন ছিল, এই শব্দের অর্থ এটি ছিল যে, (তাদেরকে) হত্যা কর। সৈন্যরা এই শব্দের অর্থ স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী এটি ধরে নেয় যে, এই বন্দিদেরকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে তারা সবাইকে হত্যা করে ফেলে। হযরত যিরার বিন আযওয়ার মালেককে হত্যা করেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আব্দ বিন আযওয়ার আসাদি মালেককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু কালবীর মতে যিরার বিন আযওয়ার তাকে হত্যা করেছিলেন। খালেদ, অর্থাৎ খালেদ বিন ওয়ালীদ যখন চিৎকার-

চেঁচামেচি শুনতে পান, তখন তিনি তার তাঁবু থেকে বের হয়ে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে সৈনিকরা সে সকল বন্দিদের জীবনাবসান ঘটিয়ে ফেলেছিল। এখন আর কিছুই করার ছিল না। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে কাজ করতে চান তা সর্বাবস্থায় হয়েই থাকে। অপর এক বর্ণনায় এটিও রয়েছে যে, হযরত খালেদ (রা.) মালেক বিন নুয়ায়রা-কে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। সাজাহ্-কে সঙ্গ দেয়া ও যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাকে বলেন, তুমি কি জান না যে, যাকাত নামাযের সাথী; অর্থাৎ উভয়টি একই ধরনের নির্দেশ, অথচ তুমি যাকাত প্রদানে অস্বীকার করেছিলে। মালেক বলে, তোমার সাথীর এটিই ধারণা ছিল। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এরূপ ধারণা ছিল-এটি না বলে, রসূল বলার পরিবর্তে সাহেব বা সাথী বলে সম্বোধন করে। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তিনি কি শুধু আমাদেরই সাথী, তোমাদের সাথী নন? এরপর তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, হে যিরার! তার শিরচ্ছেদ কর। অতঃপর তার শিরচ্ছেদ করা হয়। এটি ছিল তার মৃত্যু সংক্রান্ত একটি বর্ণনা।

ঐতিহাসিক বর্ণনানুযায়ী এ বিষয়ে আবু কাতাদা খালেদের সাথে কথা বলেন এবং উভয়ের মাঝে বিতর্ক হয় আর আবু কাতাদা হযরত খালেদের সাথে মতানৈক্য করে সেনাবাহিনী ছেড়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট চলে আসেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, মালেক বিন নুয়ায়রা-কে খালেদ হত্যা করিয়েছেন, অথচ সে মুসলমান ছিল। আর এরপর তার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিয়েছেন। আর আরবের লোকেরা যুদ্ধকালীন সময়ে এরূপ বিয়েকে ভালো জ্ঞান করে না। হযরত উমর (রা.)ও কাতাদা'র এই অবস্থানের প্রতি জোরালো সমর্থন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) আবু কাতাদা-র প্রতি এ কারণে অত্যন্ত রুষ্ট হন যে, তিনি সেনাপ্রধান হযরত খালেদের অনুমতি ব্যতিরেকে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন হযরত খালেদের নিকট ফিরে যান। সুতরাং আবু কাতাদা হযরত খালেদের নিকট ফিরে যান। ইতিহাসগ্রন্থ তাবারীতে এর বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট নিবেদন করেন যে, খালেদ একজন মুসলমানের রক্তপাতের জন্য দায়ী; আর এ বিষয়টি যদি প্রমাণিত না-ও হয়, তথাপি এতটুকু তো প্রমাণিত যার ভিত্তিতে তাকে বন্দি করা যেতে পারে। অর্থাৎ, হত্যা তো অবশ্যই হয়েছে। এ বিষয়ে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত জোর প্রদান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) যেহেতু স্বীয় কর্মচারী ও সেনা কর্মকর্তাদেরকে কখনো বন্দি করতেন না, এজন্য তিনি বলেন, হে উমর! এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন কর। খালেদ বিন ওয়ালীদের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। তুমি তার সম্পর্কে আদৌ কিছু বলো না। আর হযরত আবু বকর (রা.) মালেকের রক্তপণ দিয়ে দেন। হযরত আবু বকর খালেদ (রা.)-কে পত্র মারফত ডেকে পাঠান। তিনি আসেন এবং উক্ত ঘটনার বিস্তারিত খুলে বলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেন।

এক রেওয়ায়েতে হযরত খালেদ (রা.)-এর মদিনায় উপস্থিত হওয়ার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খালেদ (রা.) সেই যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদিনায় আসেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। তিনি যখন মসজিদে আসেন তখন হযরত উমর (রা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি এক মুসলমানকে হত্যা করেছ। উপরন্তু তার স্ত্রীকে হস্তগত করেছ। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব। সেই মুহূর্তে হযরত খালেদ

(রা.) মুখ দিয়ে টু শব্দ করেন নি, কেননা তিনি ধারণা করেছিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ধারণাও তা-ই। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন, পুরো বৃত্তান্ত খুলে বলেন এবং ক্ষমা চান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে ক্ষমা করে দেন। হযরত আবু বকর (রা.)-কে সন্তুষ্ট করে তিনি উঠে চলে আসেন। হযরত উমর (রা.) মসজিদে বসা ছিলেন। খালেদ (রা.) বলেন, হে উম্মে শামলার পুত্র! আমার কাছে আসো, তোমার কী বলার আছে বল? হযরত উমর (রা.) বুঝতে পারেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই হযরত খালেদ (রা.) এভাবে কথা বলছেন। হযরত উমর (রা.) চুপচাপ উঠে নিজের ঘরে চলে যান এবং হযরত খালেদের সাথে আর কোন কথা বলেন নি।

অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালেকের ভাই মুতাম্মিম বিন নুয়ায়রা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে নিজ ভাইয়ের রক্তপণ গ্রহণ করতে আসে এবং নিবেদন করে যে, আমাদের বন্দিদেরকে মুক্ত করে দেয়া হোক। হযরত আবু বকর (রা.) বন্দিদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে তার আবেদন গ্রহণ করেন এবং অধ্যাদেশ লিখে দেন আর মালেকের রক্তপণ প্রদান করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-এর বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন যে, তাকে যেন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং বলেন, তার তরবারি নিষ্পাপ মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে উমর! এটি হতে পারে না। আমি সেই তরবারিকে, যা আল্লাহ্ তা'লা কাফেরদের উদ্দেশ্যে খাপ থেকে বের করেছেন, পুনরায় খাপে ঢুকাব না। হযরত আবু বকর (রা.) যেহেতু রক্তপণ আদায় করে দিয়েছেন অতএব শরীয়ত অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর আর কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। তাই হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এ বিষয়টি এখানেই শেষ কর।

মালেক বিন নুয়ায়রাকে হত্যা বিষয়ক যে অভিযোগ রয়েছে এর উত্তর প্রদান করতে গিয়ে হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (রহ.) তার তোহফায়ে আসনা আশারিয়া পুস্তকে লিখেন, আসলে যা ঘটেছে তার সঠিক ব্যাখ্যা ঐসকল লোক বর্ণনা করে নি, আর যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক অবস্থা জানা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপত্তি উত্থাপন করা অযৌক্তিক। সীরাত ও তারীখ তথা জীবনচরিত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য পুস্তকগুলোতে এই ঘটনার বিস্তারিত হলো, নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদার তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদ আসাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান শেষে হযরত খালেদ (রা.) যখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বুতাহ্-এর দিকে মনোযোগী হন তখন তিনি চতুর্দিকে সামরিক দল প্রেরণ করেন আর মহানবী (সা.)-এর আজ্ঞা ও পদ্ধতি অনুযায়ী তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, যে জাতি, গোত্র বা দলের ওপর অভিযান চালাবে, সেখানে যদি তোমরা আযান শুনতে পাও তাহলে সেখানে হত্যাযজ্ঞ বা খুনোখুনি থেকে বিরত থাকবে। আর যদি আযান না শোনা যায় তাহলে সেটিকে 'দারুল হার্‌ব' (তথা যুদ্ধক্ষেত্র) আখ্যা দিয়ে সেখানে পূর্ণ সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে। ঘটনাক্রমে উক্ত দলে জনাব আবু কাতাদা আনসারী (রা.)-ও ছিলেন যিনি মালেক বিন নুয়ায়রাকে পাকড়াও করে হযরত খালেদ (রা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন, যাকে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বুতাহ্-এর নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল আর তার আশেপাশের অঞ্চলের সদকা ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্বও তার ওপর ন্যাস্ত ছিল। জনাব আবু কাতাদা (রা.) আযান শোনার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কিন্তু সেই দলেরই এক দল লোক বলে যে, আমরা আযানের ধ্বনি শুনি নি, কিন্তু এর পূর্বেই আশেপাশের নির্ভরযোগ্য লোকদের মাধ্যমে সুনিশ্চিত ও প্রমাণিত বিষয় হিসেবে জানা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর

তিরোধানের সংবাদ শুনে মালেক বিন নুয়ায়রা-র পরিবারের সদস্যরা খুব আনন্দোৎসব করেছিল; মহিলারা হাতে মেহেদি লাগিয়েছিল, ঢাক-ঢোল বাজিয়েছিল এবং অনেক বেশি আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করেছিল এবং মুসলমানদের এই বিপদ দেখে খুব খুশি হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি বিষয় ঘটে; মালেক বিন নুয়ায়রাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মহানবী (সা.) সম্পর্কে তার মুখ দিয়ে এমন বাক্যাবলী বের হয় যা কাফের ও মুরতাদরা নিজেদের আলাপচারিতায় (ব্যবহার করতে) অভ্যস্ত ছিল এবং ব্যবহার করতো। অর্থাৎ, **'ক্বালা রাজুলুকুম আও সাহেবুকুম'** যার অর্থ হলো, **'তোমাদের লোক বা তোমাদের সাথী এমনটি বলেছে'**। এছাড়া এই বিষয়টিও প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুসংবাদ শুনে মালেক বিন নুয়ায়রা আদায়কৃত যাকাতও নিজ গোত্রকে একথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল যে, **'ভালোই হয়েছে! এই ব্যক্তির মৃত্যুতে তোমরা বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছ!'** এসব ঘটনা এবং তার কথাবার্তার ধরন প্রত্যক্ষ করে হযরত খালেদ তার মুরতাদ হবার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যান এবং তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। মদিনায় যখন এই ঘটনার সংবাদ পৌঁছে এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আবু কাতাদাও রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছেন আর হযরত খালেদকেই দোষী সাব্যস্ত করেন, তখন প্রথমে হযরত উমর ফারুকেরও এই ধারণাই হয়েছিল যে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং কিসাস (বা হত্যার প্রতিশোধ) গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.), হযরত খালেদকে তলব করে ঘটনা তদন্ত করেন, তার কাছে (ঘটনার) পুরো বিবরণ জিজ্ঞেস করেন এবং প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনার রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়; তখন তিনি তাকে নির্দোষ আখ্যা দেন এবং তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে স্বপদে বহাল রাখেন।

মালেক বিন নুয়ায়রার হত্যার বিষয়ে আরেকজন লেখক লিখেছেন যে, মালেক বিন নুয়ায়রা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলোতে অনেক বেশি অসামঞ্জস্য রয়েছে। তার সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে সেগুলোতে অনেক মতানৈক্য রয়েছে যে, সে কি নির্যাতিত অবস্থায় নিহত হয়েছিল নাকি সে হত্যাযোগ্য ছিল? মালেক বিন নুয়ায়রাকে যে জিনিষটি ধ্বংস করেছিল তা হলো, তার অহংকার, দাম্ভিকতা ও ধর্মত্যাগ। তার মাঝে অজ্ঞতা রয়ে গিয়েছিল, নতুবা মহানবী (সা.)-এর পর রসূলের খলীফার আনুগত্য ও বায়তুল মালের প্রাপ্য যাকাত প্রদানে সে টালবাহানা করতো না। তিনি লিখেন, আমার ধারণামতে এই ব্যক্তির দলপতি হবার ও নেতাগিরির শখ ছিল, সেইসাথে বনু তামীম গোত্রের নেতাদের মধ্যে নিজের কতিপয় সেসব নিকটাত্মীয়ের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল যারা ইসলামী খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল এবং রাষ্ট্রীয় কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছিল। [অর্থাৎ, যারা খিলাফতের আনুগত্য বরণ করেছিল এবং যাকাত প্রভৃতি প্রদান করছিল– তাদের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল।] তার কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ড উভয়ই এই মতামতের সমর্থন করে। তার মুরতাদ হওয়া এবং সাজাহ্-র সাথে হাত মেলানো, যাকাতের উট নিজের লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া, আবু বকর (রা.)-এর কাছে যাকাত প্রেরণে বাধা দেয়া, বিদ্রোহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে নিজ মুসলমান নিকটাত্মীয়দের উপদেশ না শোনা– এসবকিছু তার অপরাধ সাব্যস্ত করে। আর এসবকিছু থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যক্তি ইসলামের চেয়ে কুফরের অধিক নিকটবর্তী ছিল। একদিকে সে (নিজেকে) মুসলমান বলে দাবি করতো, অন্যদিকে কুফরের নিকটবর্তী ছিল। মালেক বিন নুয়ায়রার বিরুদ্ধে অন্য কোন অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, কেবল তার যাকাত আটকে রাখাই তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। প্রথম যুগের

(গবেষকদের) কাছে এটি প্রমাণিত সত্য ছিল যে, সে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ইবনে আব্দুস সালামের পুস্তক **'তাবাকাতে ফুখুল শু'আরা'**-তে বর্ণিত হয়েছে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, খালেদ মালেকের সাথে আলোচনা করেন এবং তার মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মালেক যদিও নামাযের কথা স্বীকার করে; [অর্থাৎ, সে বলে, নামায পড়ব;] কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করে। আর মুসলিম শরীফের ভাষ্যে ইমাম নববী মুরতাদদের সম্পর্কে বলেন, এদেরই মাঝে এমন লোকজনও ছিল যারা যাকাতের কথা স্বীকার করতো এবং তা প্রদান করা বন্ধ করে নি, কিন্তু তাদের নেতারা তাদেরকে এ কাজে বাধা দেয়। কিছু লোক নামাযের মতোই যাকাতও প্রদান করতে চাইতো, যাদের জন্য যাকাত দেওয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু নেতারা তাদের বাধা দেয় এবং তাদের হাত ধরে রেখেছিল, যেমন বনু ইয়ারবূ। তারা তাদের যাকাত সংগ্রহ করে সেগুলো হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করতে চাচ্ছিল কিন্তু মালেক বিন নুয়ায়রা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদের যাকাতের সম্পদ মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) মালেক বিন নুয়ায়রার বিষয়ে পুরো তদন্ত করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মালেক বিন নুয়ায়রাকে হত্যা করার অপরাধ থেকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) মুক্ত। এ বিষয়ে মূল ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত ছিলেন এবং গভীর দৃষ্টি রাখতেন, কেননা তিনি (রা.) খলীফা ছিলেন আর সব সংবাদই তাঁর কাছে পৌঁছত। এছাড়া অন্য সবার চেয়ে তাঁর ঈমানও অনেক দৃঢ় ছিল। হযরত খালেদ (রা.)-র বিষয়টি সমাধা করার ক্ষেত্রে তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ করছিলেন। কেননা মহানবী (সা.) হযরত খালেদ (রা.)-র প্রতি যে দায়িত্বভারই অর্পণ করেছেন [তা থেকে তিনি (সা.) তাকে] কখনোই অপসারণ করেন নি, যদিও তার দ্বারা এমন কিছু কাজ সম্পাদিত হয়েছে যাতে তিনি (সা.) সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি (সা.) তার অজুহাত মেনে নিতেন আর মানুষকে বলতেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.) খালেদের অজুহাত মেনে নিতেন আর লোকদের বলতেন, খালেদকে কষ্ট দিও না, সে আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর মধ্য হতে একটি তরবারি যাকে আল্লাহ্ তা'লা কাফেরদের ওপর নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, হযরত খালেদ (রা.) উম্মে তামীম বিনতে মিনহালকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়, যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই তিনি (রা.) লায়লা বিনতে মিনহালকে বিয়ে করেন আর ইদ্দত পার হওয়ারও অপেক্ষা করেন নি। এ বিয়ে সম্পর্কে ইতিহাসগ্রন্থ তাবারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালেদ (রা.) উম্মে তামীম মিনহালের মেয়েকে বিয়ে করার পর তার পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। কেননা আরবরা যুদ্ধ চলাকালীন নারীদের সাথে মেলামেশা অপছন্দ করতো, আর কেউ এমনটি করলে তাকে ভর্ৎসনা করতো।

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেন, তিনি, অর্থাৎ লায়লা বিনতে মিনহাল যখন হালাল বা পবিত্র হন তখন হযরত খালেদ (রা.) তাকে বিয়ে করেন। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান লিখেন, উম্মে তামীম তিন মাস সময় অতিবাহিত করে তার ইদ্দত পূর্ণ করার পর হযরত খালেদ (রা.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন আর সে তা গ্রহণ করে। হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয দেহ্‌লভী এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে লিখেন, মূলত উক্ত ঘটনাটিই মনগড়া, কেননা কোন নির্ভরযোগ্য ও প্রত্যয়িত গ্রন্থে এর কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। কোন কোন অনির্ভরযোগ্য পুস্তকে এই রেওয়ায়েত পাওয়া গেলেও এর উত্তরও একই সাথে সেই রেওয়ায়েতেই বিদ্যমান রয়েছে

যে, মালেক বিন নুয়ায়রা এই মহিলাকে অনেক দিন পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছিল। বলা হয় যে, (সে) মালেক বিন নুয়ায়রার স্ত্রী ছিল আর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তাকে হত্যা করার পরপরই তাকে বিয়ে করেন। হত্যা করার মূল কারণই ছিল, তিনি বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন। যাহোক, তিনি বলেন, মালেক বিন নুয়ায়রা এই মহিলাকে অনেক দিন পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছিল। আর অজ্ঞতার যুগের (রীতির) অনুসরণে সে তাকে এমনিতেই বাড়িতে আটকে রেখেছিল। অজ্ঞতার যুগের এই প্রথা দূর করার জন্যই পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যে, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (সূরা আল্ বাকারাঃ ২৩৩) অর্থাৎ, তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও আর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায় তখন তাদেরকে আটকে রেখো না। কাজেই, এই মহিলার ইদ্দত অনেক আগেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বিধায় বিয়ে বৈধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা, সে (তাকে) তালাক দিয়ে নিজের বাড়িতে আটকে রেখেছিল।

হযরত খালেদ (রা.)-র বিয়ে সম্পর্কে আরেকজন লেখক লিখেন, উম্মে তামীমের নাম ছিল লায়লা বিনতে সিনান মিনহাল। সে মালেক বিন নুয়ায়রার স্ত্রী ছিল। তার সাথে হযরত খালেদ (রা.)-এর বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা ঘটে। অনেক ঝগড়বিবাদ হতে থাকে আর অনেক তর্কবিতর্ক হয়। এর সারাংশ হলো, কিছু লোক হযরত খালেদ (রা.)-র ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি উম্মে তামীমের রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাকে ভালোবাসতেন। তাই ধৈর্য ধরতে পারেন নি আর বন্দি হিসেবে (তার করায়ত্তে) আসতেই তাকে বিয়ে করে ফেলেন। এর অর্থ হলো, নাঊযুবিল্লাহ্; এটি বিয়ে নয় বরং ব্যাভিচার ছিল। কিন্তু এই বক্তব্য মনগড়া এবং সুস্পষ্ট মিথ্যা, এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রাচীন সাহিত্য বা উৎসে (অর্থাৎ, পুস্তক-পুস্তিকায়) এর প্রতি কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। (অর্থাৎ) যেসব রেওয়ায়েত বা উৎস রয়েছে (তাতেও) এমন কোন দলিল পাওয়া যায় না যদ্বারা (এটি) প্রমাণ হয়। আল্লামা মাওয়ারদী বলেন, মালেক বিন নুয়ায়রাকে খালেদ (রা.) একারণে হত্যা করেছিলেন যে, সে যাকাত আটকে রেখেছিল, যার ফলে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে গিয়েছিল। আর এ কারণে উম্মে তামীমের সাথে তার বিবাহ অবৈধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া মুরতাদদের স্ত্রীদের বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশ হলো, তারা যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগ দেয় তাহলে তাদের বন্দি করবে, হত্যা করবে না। যেভাবে ইমাম সারখাসী এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। উম্মে তামীম যখন বন্দি হিসেবে আসে তখন খালেদ (রা.) তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেন আর সে ইদ্দত পূর্ণ করার পর তিনি তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়েন। অপরদিকে শেখ আহমদ শাকের এই বিষয়ের সাথে আরও (কিছু) কথা যুক্ত করেন, অর্থাৎ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, খালেদ (রা.) উম্মে তামীম এবং তার পুত্রকে ডান হাতের অধীনস্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তারা যুদ্ধবন্দি ছিল আর এমন মহিলাদের জন্য ইদ্দতের কোন (শর্ত) নেই। (যুদ্ধবন্দি মহিলা) যদি গর্ভবতী হয় তাহলে (সন্তান) প্রসব না করা পর্যন্ত তার মালিকের তার কাছে গমন করা অবৈধ। কিন্তু গর্ভবতী না হলে একবার ঋতুবতী হওয়া পর্যন্ত দূরে থাকবে। এটি শরীয়ত সম্মত এবং বৈধ। এক্ষেত্রে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু খালেদ (রা.)-র বিরোধী ও শত্রুরা এই সুযোগকে নিজেদের জন্য মোক্ষম সুযোগ জ্ঞান করেছে এবং এই অলীক আত্মপ্রসাদে নিপতিত হয় যে, মালেক বিন নুয়ায়রা মুসলমান ছিল আর খালেদ (রা.) তার স্ত্রীকে পাবার জন্য তাকে হত্যা করেছে। একইভাবে খালেদ (রা.)-র প্রতি এই অপবাদও আরোপ করা হয় যে, এই বিবাহের মাধ্যমে তিনি আরবের

রীতিনীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছেন। যেমন, উকাদের বক্তব্য হলো, মালেক বিন নুয়ায়রাকে হত্যা করে যুদ্ধক্ষেত্রেই তার স্ত্রীকে খালেদের বিয়ে করা অজ্ঞতা ও ইসলামী যুগে আরবের রীতি বহির্ভূত কাজ আর একইভাবে মুসলমানদের রীতিনীতি এবং ইসলামী শরীয়তের বিধিনিষেধেরও লঙ্ঘন। উকাদের এই বক্তব্য একেবারেই সত্য বিবর্জিত। প্রাক ইসলামিক যুগে আরবে বহুবার এমনটি হয়েছে যে, যুদ্ধ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর তারা মহিলাদের বিয়ে করতো আর একাজে তারা গর্ববোধ করতো। ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী এ সম্পর্কে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে (বুঝা যায় যে,) খালেদ (রা.) একটি বৈধ কাজই করেছেন আর এজন্য শরীয়তসম্মত বৈধ রীতি অবলম্বন করেছেন। এছাড়া এমন কাজ তো সেই (মহান) সত্তার পক্ষ থেকেও প্রমাণিত যিনি খালেদ (রা.)-র তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যদি খালেদ (রা.)-র ওপর এই আপত্তি করা হয় যে, তিনি যুদ্ধ চলাকালে বা এর অব্যবহিত পরে বিয়ে করেছেন তাহলে মহানবী (সা.) মুরাইসির যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জুয়ায়রা বিনতে হারেসকে বিয়ে করেছিলেন। আর এটি তার জাতির জন্য অনেক কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, এই বিয়ের ফলে তার বংশের একশ' লোককে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল, কেননা তারা মহানবী (সা.)-এর শ্বশুরকুলের আত্মীয় হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া এই বিয়ের আশিসপূর্ণ প্রভাবের মধ্যে এটিও ছিল যে, তার পিতা হারেস বিন যেরার মুসলমান হয়ে যান। অনুরূপভাবে খায়বারের যুদ্ধের পরক্ষণেই মহানবী (সা.) সাফিয়া বিনতে হুয়ী বিন আখতাবকে বিয়ে করেন। কাজেই, এক্ষেত্রে যখন মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে তখন ভর্ৎসনা ও নিন্দার কোন কারণ নেই যে, অকারণে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র প্রতি অপবাদ আরোপ করা হবে। এই বিশদ আলোচনা আমি এজন্য করছি কেননা কোন কোন স্বল্পজ্ঞানী আজও এই প্রশ্নের অবতারণা করে আর তারা মূলত হযরত আবু বকর (রা.)-র প্রতি এই আপত্তি করে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) সঠিক ছিলেন, কিন্তু নাঊযুবিল্লাহ্ হযরত আবু বকর (রা.) ন্যায়সঙ্গত কাজ করেন নি আর অন্যায়ভাবে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে সমর্থন করেছেন। অথচ হযরত আবু বকর (রা.) পুরো ঘটনা যাচাই করেন এবং তদন্ত করার পর সিদ্ধান্ত প্রদান করেন আর এসব অপবাদ থেকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে মুক্ত করেন।

হযরত খালেদ (রা.)-র ইয়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি যেন আসাদ ও গাতফান গোত্র এবং মালেক বিন নুয়ায়রা প্রমুখকে দমন করার পর ইয়ামামা অভিমুখে যাত্রা করেন আর এজন্য অত্যন্ত জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। শরীক বিন আবদা ফুযারী বর্ণনা করেন যে, আমি **বুযাখা**-র অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.)-র সমীপে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে খালেদ (রা.)-র নিকট প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ (রা)-র নামে আমার সাথে একটি পত্র ছিল যাতে লেখা ছিল, পরসমাচার! তোমার বার্তবাহক মারফত তোমার পত্র পেয়েছি। এতে তুমি বুযাখা-র যুদ্ধে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয় এবং সাহায্য ও সমর্থনের উল্লেখ করেছ। আর আসাদ ও গাতফান (গোত্রে)-র সাথে তুমি যা করেছ তা-ও উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া তুমি লিখেছ যে, আমি ইয়ামামা অভিমুখে যাত্রা করছি। তোমার জন্য আমার উপদেশ হলো, (তুমি) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করবে আর তোমার সাথে যেসব মুসলমান রয়েছে তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করবে। তাদের সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করবে। হে খালেদ

সাবধান! বনু মুগীরার অহংকার ও দাম্ভিকতা থেকে আত্মরক্ষা করবে। আমি তোমার সম্পর্কে তাদের পরামর্শ শুনি নি যাদের কথা আমি কখনো উপেক্ষা করি না। কাজেই, তুমি যখন বনু হানীফাকে মোকাবিলার জন্য অবতীর্ণ হবে তখন সাবধান থাকবে। স্মরণ রেখো! এখনও পর্যন্ত বনু হানীফার মতো অন্য কারো মুখোমুখি তুমি হও নি। তারা সবাই তোমার বিরোধী এবং তাদের দেশ অনেক বড়। অতএব, সেখানে পৌঁছে তুমি স্বয়ং সেনাবাহীনির নেতৃত্বভার পালন করবে। (সেনাদলের) ডান দিকের দায়িত্বে একজন, বাম দিকের দায়িত্বে একজন এবং অশ্বারোহীদের ওপর একজনকে নিযুক্ত করবে। মুহাজের ও আনসারদের মাঝ থেকে যেসব জ্যেষ্ঠ সাহাবী তোমার সাথে আছেন তাদের কাছ থেকে নিয়মিত পরামর্শ নিবে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে সম্মান করবে। শত্রুরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয় তখন তাদের ওপর পূর্ণ প্রস্তুতিসহ ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিরের বিপরীতে তির, বর্শার বিপরীতে বর্শা এবং তরবারির বিপরীতে তরবারি (দ্বারা আক্রমণ করবে)। তাদের বন্দিদেরকে তরবারির জোরে তুলে আনবে। হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে তাদের মাঝে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করবে। তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবে। সাবধান! আমার আদেশ অমান্য করবে না। পুনরায় তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

এই পত্র পাওয়া মাত্রই খালেদ (রা.) তা পাঠ করে বলেন, আমরা শুনেছি আর আমরা এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করব। খালেদ (রা.) নিজের সাথে মুসলমানদেরকেও প্রস্তুত করেন এবং বনু হানীফা, অর্থাৎ মুসায়লামা বা মুসায়লামা কায্যাব যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আনসারদের আমীর নিযুক্ত ছিলেন, সাবেত বিন কায়েস বিন শিমাস। পথিমধ্যে যেসব মুরতাদ সামনে পড়েছে তাদেরকে তিনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন। অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.) খালেদ (রা.)-র নিরাপত্তার খাতিরে পেছন থেকে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল একটি সেনাদল প্রেরণ করেন যেন খালেদ (রা.)-র বাহিনীকে পেছন থেকে কেউ আক্রমণ করতে না পারে। ইয়ামামার পথে খালেদ (রা.) অনেক বেদুঈন গোত্র অতিক্রম করেন যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদের সাথে যুদ্ধ করে (তিনি) তাদেরকে ইসলামে ফিরিয়ে আনেন। পথিমধ্যে সাজাহ্'র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্যদের দেখা পেলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, অর্থাৎ; তাদেরকে হত্যা করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। এরপর ইয়ামামার ওপর আক্রমণ করেন। ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে তুলে ধরা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)